সংকলিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

* চিহ্নিত রচনাগুলি একাধারে কবিতা এবং গান

প্রথম রচনাটি ভারতের জাতীয়সংগীত

ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি-ভালে-
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

ভারততীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার—
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর-
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে— তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল, একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

৯ পরশ-পাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চাল-চুলা, গায়ে মাখে ছাই-ধুলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,

তার এত অভিমান— সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটি কুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্বগগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে—
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এত দিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু—
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।

তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন—
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।
যত করে হায়-হায় কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু— ওই তার ব্রত!
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহ তারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর একি, কাঁকালে ও কি ও দেখি?
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
এ কী কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার
আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন!
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভূমি-'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা—
পাগলের মতো চায় কোথা গেল হায় হায়
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর—
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর!

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন !
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্‌বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর, নুয়ে পড়ে দেহভার,
অন্তর লুটায় ছিন্নতরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ প'ড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন-রজনী-ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

শেষ শিক্ষা

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা— যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণ রূপে দিয়েছিল দেখা,
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটময়। তবে এ কি ভুল !

তবে কি জীবন ব্যর্থ!— দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল। হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, 'যাব চলি দেশে,
ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দাও তার দাম।'
কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজি, সেলাম।
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই।'
পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত
'চোর' বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, 'বুঝিলাম আজ,
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।'

পুত্র ছিল পাঠানের, বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে

খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, 'একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর তার স্বভাব কি ফেরে?
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো, হবে যে প্রখর।'
গুরু কহে, 'তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।'

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন, সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজির। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
"শিক্ষা মোর শেষ হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজ ভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।'
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
'আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।'

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা ; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
'অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।' ভক্তদল
'সঙ্গে যাব' 'সঙ্গে যাব' করে কোলাহল।
গুরু কন, 'যাও সবে ফিরে।' দুই জনে,
কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল,
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে একধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়ালো।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিম-প্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
'মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
'পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি

খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার !' বাঘের মতন
হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে— গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান ;
কহিল, 'হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে,
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত। একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু ব'লে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা প'ড়ে হিংসা যাক ম'রে। প্রভু, দেহো
পদধূলি।'— এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্রহাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

এক দিন আরম্ভিল শতরঞ্জ-খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা

না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়। রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁট-শিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু ; কহে অট্টহাসি,
'পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার ?'
তখনি বিদ্যুৎবেগে ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, 'এত দিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু— আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে, হে পুত্র আমার !'

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ।

'অলখ নিরঞ্জন'—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন্‌
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল, 'অলখ নিরঞ্জন!'
এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ—
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে এক দিন।

দিল্লিপ্রাসাদকূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে।
পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল 'দীন্‌ দীন্‌' গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি লয়ে গেল ধ'রে
দিল্লিনগর-'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শাফলকে তুলি—
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে, বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে, বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় 'গুরুজীর জয়' পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে দিল্লিপথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি।
সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি বন্দার এক ছেলে;
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।'
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার, বন্দার এক ছেলে

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষখানি।

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে ছুরিকা খসায়ে আনি
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে কানে কয়, 'রে পুত্র, ভয় নাহি।'
নবীন বদনে অভয়-কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি
'গুরুজীর জয়! কিছু নাই ভয়' বন্দার মুখ চাহি।
বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে—
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন— সভা হল নিস্তব্ধ।

সূর্য ও ফুল

পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি-'পরে ফুল শুভ্রবাস
চারি দিকে শুভ্র দল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
'লাবণ্যকিরণছটা আমারও তো আছে।'

দুর্যোগের খেয়া

খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'ষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো!
শৃঙ্খলে বার বার ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার;
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো!

গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে'।
সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল—
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো!

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,

আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী এলায়ে?
ওগো, নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি,
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?
প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?

...তীরতৃণতলে
...মল বসনে, শ্যামল বসনে?

সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়,
নবমালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে কে ব'সে শ্যামল বসনে ?

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজল নয়নে গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃ

শরৎশ্রী

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা—
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরিপর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল শীতল-শিশির-ঢালা।
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা।

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে।
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে
মৃদুমধু ঝংকারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা।
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা।

উদারচরিতানাম্

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
'ধিক্ ধিক্' করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই ?'

পূজারিনী

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ, শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি রাজবধূ রাজবালা,
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।
কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার— ভুলিলে বিপদ হবে।'

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান— শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়ালো আসি।
শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা, 'এ কথা নাহি কি মনে—
অজাতশত্রু করেছে রটনা

স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা অথবা নির্বাসনে !'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।
শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা, কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, 'অবোধ, কী সাহস বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে বিষম বিপদপাত !'

অস্তরবির রশ্মি-আভায় খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী ;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী, চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,
'রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক'রে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে !'

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী লইয়া অর্ঘ্যথালি।
'হে পুরবাসিনী' সবে ডাকি কয়,
'হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।'
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,

আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজদেবালয়-ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান' দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপমালার মতো
মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি?'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।'

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।

আদিরহস্য

বাঁশি বলে, 'মোর কিছু নাহিকো গৌরব।
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।'
ফুঁ কহিল, 'আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি—
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি।'

দীনদান

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্‌বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি! শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমত নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।'

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
'হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়— তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?'
'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু। রাজা কহে রোষে-
'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতন-বিগ্রহ—
শূন্য তাহা?' 'শূন্য নয়, রাজদন্তে পূর্ণ' সাধু কহে—

'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান!'

শান্তমুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতিসহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিল ভগবান—
আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান। চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে—
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ্‌!'

রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক'রে
এ মুহূর্তে চলি যাও।' সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।'

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকাদুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ—
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।

দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'
সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রু-জলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো; সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে,
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে—
'থাক্, থাক্, সঙ্গে যাক্।' মা রাগিয়া বলে—
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ;
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়—

'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি।' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুর-মশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি!' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই, যাতায়াতে মাস দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।
যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হল মেলা;
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্নবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ

মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর,
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রব-সহা, আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে,
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে—
'ঠাকুর, কখন্ আজ আসিবে জোয়ার?'
সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে—
'দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তরবায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা।
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্ব ডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,

করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্!'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী,
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়!' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।

ভৎ সিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ—
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা!

শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।'
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মা'র বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি!'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্! রাখ্! রাখ্!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে!
'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

কর্তব্যগ্রহণ

'কে লইবে মোর কার্য' কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

ভাঙা মন্দির

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়

  শূন্য তোমার অঙ্গনে,

    জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—

অর্ঘ্যের আলো নাইবা সাজালো

  পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে

    যাত্রীরা তব বিস্মৃত পরিচয়—

  সম্মুখ-পানে দেখো দেখি চেয়ে

  ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে

  বনফুলদল ওই এল ধেয়ে

    উল্লাসে চারি ধারে।

  দক্ষিণবায়ে কোন্ আহ্বান

  শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,

  কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান

    আসে পৃথীর পারে।

গন্ধের থালি বর্ণের ডালি

  আনে নির্জন অঙ্গনে

    জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—

বকুল শিমুল আকন্দফুল

  কাঞ্চন জবা রঙ্গনে

  পূজাতরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

প্রতিমা নাহয় হয়েছে চূর্ণ

  বেদীতে নাহয় শূন্যতা,

    জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,

নাহয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত

আছিল যে চূড়া উন্নতা—
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জাভয় ?
বাহিরে তোমার ওই দেখো ছবি—
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ওই হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয়-জয় !
সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
নাই মুখরিল পার্বণক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথিভোগের না রহিল সঞ্চয়,
পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্যসেবার পেয়ে আয়োজন

তৃপ্ত-পরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎস-তীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক
আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলেম বিলাত,
নাই-বা পেলেম রাজার খিলাত—
যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল-বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল কালো জলে।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে।

'ওরে, বিহান হল জাগো রে ভাই' ডাকে পরস্পরে—
'ওরে, ওই-যে দধিমন্থধ্বনি উঠল ঘরে ঘরে।

হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গোখুর রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ দুগ্ধদোহন করে !'
'ওরে, বিহান হল জাগো রে ভাই' ডাকে পরস্পরে।

ওরে, শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে,
ওরে, এ-পার ও-পার আঁধার হল কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ুর কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে।

মোরা নব-নবীন ফাগুন-রাতে নীলনদীর তীরে,
কোথা যাব চলি অশোক-বনে, শিখীপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি,
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা নীলনদীর তীরে।

আমি হব না ভাই, নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক !
যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

তীর্থ

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দু ধারে আছে মোর দেবালয়।

সব-পেয়েছি'র দেশ

সব-পেয়েছি'র দেশে কারো নাই রে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে, কোথায় গেল দ্বারী ?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়, হস্তিশালায় হাতি !
স্ফটিকদীপে গন্ধতেলে জ্বালায় না কেউ বাতি ।
রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া সব-পেয়েছি'র দেশে ।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা পাশ দিয়ে তার চলে ।
কুটিরেতে বেড়ার 'পরে দোলে ঝুম্‌কা লতা ;
সকাল হতে মৌমাছিদের ব্যস্ত ব্যাকুলতা ।
ভোরের বেলা পথিকেরা কী কাজে যায় হেসে—
সাঁজে ফেরে বিনা-বেতন সব-পেয়েছি'র দেশে ।

আঙিনাতে দুপুর-বেলা মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুল-তলার ছায়ায় বসে চরকা কাটে মেয়ে ।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি হঠাৎ আসে প্রাণে ।
নীল আকাশের হৃদয়খানি সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায় সব-পেয়েছি'র দেশে ।
সদাগরের নৌকা যত চলে নদীর 'পরে,
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ কেনা-বেচার তরে ।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা কাঁপিয়ে চলে পথ,
হেথায় কভু নাহি থামে মহারাজের রথ ।

এক রজনীর তরে হেথা দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই সব-পেয়েছি'র দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি, নাইকো হাটে গোল—
ওরে কবি, এইখানে তোর কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধুলো নামিয়ে দে রে বোঝা—
বেঁধে নে তোর সেতারখানা, রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্ রে হেথায় সারাদিনের শেষে।
তারায়-ভরা আকাশ-তলে সব-পেয়েছি'র দেশে।

বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে!
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে
কে যেন ডাকিল রে 'জল্‌কে চল্'।

কলসী লয়ে কাঁখে, পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধুধু,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা!
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে,
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট—
পাখির গান কই, বনের ছায়া।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।
নিমেষ-তরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয়, আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্।'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

চিরন্তন

চাহিয়া প্রভাতরবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে'
বলিয়া পড়িল টুটে।

সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া

যাবই আমি যাবই ওগো   বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি,   অলক্ষ্মীরে পাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি   বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে   কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী   বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়   সোনার বালুর তীরে।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ,   প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে   সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে,
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে   বইছে নগনদী।
সাত-রাজার ধন মানিক পাবই   সেথায় নামি যদি।

হেরো   সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে   ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই   তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ-মনে   রইব না আর কভু।

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য না'য়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারী মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো।

দুর্লভ

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥

৭ই পৌষ ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

('দুর্লভ কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র')

মামলা

বাসাখানি গায়ে লাগা আর্মানি গির্জার
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার!
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে!
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তক্‌রার—
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার?
কিংবা মিয়াঁও বলে থাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে—
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝোঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির—
জজসা'ব কী ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।
সমন হয়েছে জারি; কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চ'ড়ে, পিছু ঝাড়ু-বর্দার।
উটেতে কামড় দিল— হল তার পা টুটা;
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের;
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখ্‌রোট-খোবানি
কাঁউসিল-ঘরে আজ কী নাকানি-চোবানি।

ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে—
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা— মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি!
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী;
নাইল-তটিনী-তট -বিহারিণী কিশোরী!
রোঁয়াতে সে ইরানি যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্‌ডনেতে।
বাঙালি থিসিস্‌ওলা পড়ে গেছে ভাব্‌নায়,
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাব্‌নায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক-তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—
কী ভীষণ হাড়-কাটা করাতের কলা রে!
বিজ্ঞানীদল এল বর্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাত-পাকা, জন্তর নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, 'বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই!'
বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না;
মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, 'সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো?'
পেয়াদা বললে, 'লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।'
জজ বলে, 'গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান।'

পেয়াদা বললে, 'তারো   নয় বড়ো কম মান ;
মিউনিকে নিয়ে গেছে   ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে   ফেরাবার পথ নেই।'
বিড়াল ফেরার হল,   নাই নামগন্ধ ;
জজ বলে, 'তাই ব'লে   মামলা কি বন্ধ !'
তখনি চৌকি ছেড়ে   রেগে করে পাচারি ;
থেকে থেকে হুংকারে   কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, 'গেল কোথা   ফরিয়াদী আসামী ?'
'হুজুর' পেয়াদা বলে,   'বেটাদের চালাকি !
শুনি নাকি দুই ভাই   উকিলের তাকাদায়
বলে গেছে, আমাদের   বুঝি বেঁচে থাকা দায়।'
কণ্ঠে এমনি ফাঁস—   এঁটে দিল জড়িয়ে !
মোক্তারে কী করিবে   সাক্ষীরে পড়িয়ে !'

ভারতের শিক্ষা

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসনভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার !
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসারে রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করো না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন-পতিতের ভগবান?
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

মর্তমাধুরী

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ !
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে ; তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে ! ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

স্নান-সমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্‌ ক'রে।
রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসংকাশ সূর্যোদয়ের দিকে।

মনে মনে বলছেন—
'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না!
ঘোচাও তোমার আবরণ!'

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ও পারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধালো, 'বিলম্ব কেন প্রভু,
পূজার সময় যায় বয়ে।'
রামানন্দ উত্তর করলেন, 'শুচি হয় নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।'
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা!

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে— উঠলেন জল ছেড়ে,
চললেন বন-ঝাউ ভেঙে গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধালো, 'কোথায় যাও প্রভু,
ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া!'
গুরু বললেন, 'চলেছি স্নান-সমাপনের পথে।'

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানর-দলের লাফালাফি।

গলি পৌঁছয় ভাজন-মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।

শিষ্য বললে, 'রাম! রাম!'
ভ্রূকুটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।
ভাজন লুটিয়ে প'ড়ে গুরুকে প্রণাম করলে সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী করলেন প্রভু!
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে!'
রামানন্দ বললেন, 'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত ক'রে তাঁর সঙ্গে মনের
মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে বইল সেই
বিশ্বপাবন ধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি
আমার মধ্যেও তিনি—
তবুও আজ দেখা হল না কেন!
এতক্ষণে মিলল তার দর্শন তোমার ললাটে আর
আমার ললাটে।
মন্দিরে আর হবে না যেতে।'

দেব-ঋণ

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার 'দাও' বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে, স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে—
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন ক'রে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত-জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ,
দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে ;
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।

কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।
কিরাত থাকে সমাজের বাইরে
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত— আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়,
কৃষ্ণশিলার মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে ;
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত।
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিমদিগন্তে যায় দেখা—

চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আঁকে;
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক-পূর্ণিমা, পূজার উৎসব!
মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি, মৃদঙ্গ, করতাল;
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত;
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা!
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়,
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল, মালা, ধূপ, বাতি, ঘড়া-ঘড়া তীর্থবারি।

বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি;
কথক পড়ছে রামায়ণ-কথা।
উজ্জ্বল বেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চ'ড়ে।
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়;
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে-ঢাকা পাল্‌কিতে ধনীঘরের গৃহিণী;
আগে পিছে কিংকরের দল;
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়—
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপতণ্ডুল।
থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি—
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়!
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা।
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চ'ড়ে।

তাঁর

...পথের দুই ধারে

সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,

মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব ;

আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি।

শুক্লত্রয়োদশীর রাত।

মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।

আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,

জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—

যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।

বাতাস রুদ্ধ—

ধোঁওয়া জমে আছে আকাশে ;

গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।

কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে ;

ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে

কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে,

পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—

গুরু গুরু গুরু গুরু ;

মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবলশব্দে।

হাতি বাঁধা ছিল,

তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে

ছুটল চার দিকে যেন ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ।

তুফান উঠল মাটিতে—

ছুটল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া

ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।

হাজার হাজার দিশাহারা লোক

আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায় ;
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ’লে !
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁওয়া, ওঠে গরম জল—
ভীম-সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং—
আচমকা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।

পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁওয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক্‌ যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল—
দেখলে, বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।
রাজা বললেন, ‘সংস্কার করো।’
মন্ত্রী বললেন, ‘ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ ?
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে ?
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা ?’

কিরাতদলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ ;
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দ ফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ওই কৃপা'
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই ;
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে ?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে
কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী ;
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না ;
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো।
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়-হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ।'

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।

কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে ?'
মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে—
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'
ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল ;
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল ; পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে,
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল। মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে ;
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে ;
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

তোমার পতাকা

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখেরই সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে ;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে ;
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তি-হরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন— কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মরণ করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে—
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ-চরণে।

জয়যাত্রা

আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার !
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার !

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি
বিপদ বাধা নাহি গণি,
ওগো কর্ণধার !
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার !
তোমারে করি নমস্কার !

এখন রইল যারা আপন ঘরে
চাব না পথ তাদের তরে,
ওগো কর্ণধার !
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার—
তোমারে করি নমস্কার !

মোদের কে বা আপন, কে বা অপর,
কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর,
ওগো কর্ণধার !
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার !

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধরো গো হাল,
ওগো কর্ণধার !
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার !

আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে
ফিরব না আর বারে বারে,
ওগো কর্ণধার !
কেবল তুমিই আছ, আমরা আছি, এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার !